রং পেন্সিল

হুমায়ূন আহমেদ

www.AmarBoi.com

অমরত্ব

আমার বাবার ফুফুর নাম সাফিয়া বিবি। তিনি অমরত্বের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী, পুত্র-কন্যারা মরে গেল, নাতি মরে গেল, তিনি আর মরেন না। চোখে দেখেন না, নড়তে-চড়তে পারেন না। দিন-রাত বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে পিঠে বেড সোর [শয্যাকণ্টক] হয়ে গেল। পচা মাংসের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। রাতে তাঁর ঘরের চারপাশে শিয়াল ঘুরঘুর করে। পচা মাংসের গন্ধে একদিন তাঁর ঘরের টিনের চালে দুটি শকুন এসে বসল। টিন বাজিয়ে, ঢিল ছুড়ে শকুন তাড়ানো হলো। সেই তাড়ানোও সাময়িক, এরা প্রায়ই আসে। কখনো একা, কখনো দলেবলে।

গ্রামের প্রচলিত বিশ্বাস, তওবা পড়ানো হলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তওবা পড়ানোর জন্যে মুন্সি আনা হলো। সাফিয়া বিবি বললেন, 'না গো! আমি তওবার মধ্যে নাই। তওবা করতে হইলে অজু করা লাগবে। শইল্যে পানিই ছোঁয়াইতে পারি না, অজু ক্যামনে করব?'

সাফিয়া বিবির মনে হয়তো ভয় ঢুকে গিয়েছিল, তওবা মানেই মৃত্যু। তিনি মৃত্যু চান না, তবে রাত গভীর হলেই আজরাইলকে ডাকাডাকি করেন। এই ডাকাডাকি মধ্যরাতে শুরু হয়, শেষ হয় ফজর ওয়াক্তে। কারণ তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সাফিয়া বিবির আজরাইলকে ডাকার নমুনা_

'ও আজরাইল! তুই কি অন্ধ হইছস? তুই আমায় দেখস না। সবের জান কবচ করস, আমারটা করস না কেন? আমি কী দোষ করছি?'

সাফিয়া বিবির বিলাপ চলতেই থাকে। আজরাইল তাঁর বিলাপে সায় দেয় না তবে এক রাতে দিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমারে ডাকস কেন? কী সমস্যা?'

হতভম্ব সাফিয়া বিবি বললেন, 'আপনি কে?'

তুই যারে ডাকস আমি সে।

সাফিয়া বিবি বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম।'

গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম!'

[পাঠকরা অবশ্যই বুঝতে পারছেন, দুষ্ট কোনো লোক আজরাইল সেজে সাফিয়া বিবির সঙ্গে মজা করছে। দুষ্টলোকের পরিচয়, তিনি আমার ছোট চাচা এরশাদুর রহমান আহমেদ। প্র্যাকটিক্যাল জোকের অসামান্য প্রতিভা নিয়ে আসা পৃথিবীর অতি অকর্মণ্যদের একজন। তিনি নিশিরাতে মুখে চোঙা ফিট করে বুড়ির সঙ্গে কথা বলছেন।]

সাফিয়া বিবি! বলো কী জন্যে এত ডাকাডাকি?

এমনি ডাকি। আমি ভালো আছি। সুখে আছি। আপনি চলে যান। কষ্ট করে এসেছেন এই জন্যে আসসালাম।

মরতে চাও না?

কী বলেন? কেন মরব? অনেক কাইজ-কাম বাকি আছে।

সাফিয়া বিবি হলেন জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতার দু'টি লাইন-

'গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'

বঙ্গদেশের হতদরিদ্র সাফিয়া বিবি দুই মুহূর্তের জন্য ভিক্ষা মাগছেন। এই ভিক্ষা তো অতি ক্ষমতাবান নৃপতিরাও মাগেন। বিশ্বজয়ী চেঙ্গিস খাঁ শেষ বয়সে সমরখন্দে এসেছেন। যদি সমরখন্দের আবহাওয়ায় তাঁর শরীর কিছুটা সারে। তিনি চিকিৎসকদের হুকুম দিয়েছেন অমরত্ব পানীয় (Elixir of Life) তৈরির, যে পানীয় তৈরি করতে পারবে সে বেঁচে থাকবে, অন্যদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড।

চীনের মিং সম্রাট খবর পেলেন, জিন সেং নামের এক গাছের মূলে আছে যৌবন ধরে রাখার গোপন রস। তিনি ফরমান জারি করলেন, মিং সম্রাট ছাড়া এই গাছের মূল কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। শুধুমাত্র রাজকীয় বাগানে এই গাছের চাষ হবে। অবৈধভাবে কাউকে যদি এই গাছ লাগাতে দেখা যায় বা গাছের মূল সেবন করতে দেখা যায়, তার জন্যে চরম শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড।

পারস্য সম্রাট দারায়ুস খবর পেলেন, এক গুহার ভেতরে টিপটিপ করে পানির ফোঁটা পড়ে। সেই পানির ফোঁটায় আছে অমরত্ব। সঙ্গে সঙ্গে গুহার চারদিকে কঠিন পাহারা বসল। স্বর্ণভাণ্ডে সংগৃহীত হতে থাকল অমৃত। লাভ হলো না।

Elixir of life-এর সন্ধানে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এটার সঙ্গে ওটা মেশান। আগুনে গরম করেন। ঝাঁকাঝাঁকি করেন। অমরত্ব ওষুধ তৈরি হয় না। সবই পণ্ডশ্রম তবে এই পণ্ডশ্রম জন্ম দিল 'আলকেমি'র রসায়নশাস্ত্রের।

অমরত্বের চেষ্টায় মানুষ কখনো থেমে থাকেনি। যে-কোনো মূল্যেই হোক মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তা সম্ভব হলো না। মানুষ ভরসা করল মৃত্যুর পরের অমরত্বের জন্যে। পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থও (মহাযান, হীনযান ছাড়া) মৃত্যুর পর অমরত্বের কথা বলছে। স্বর্গ-নরকের কথা বলছে। এই পৃথিবীতে যে অমরত্বের সম্ভাবনা নেই, পরকালে তার অনুসন্ধান। বাদ সাধল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বলে, মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়া শরীরের ইলেকট্রন, প্রোটনের অমরত্ব আছে। কিন্তু ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন মানুষের স্মৃতি বহন করবে না।

এই যখন অবস্থা তখন Frank J Tipler একটি বই লিখলেন। বইয়ের নাম Physics of Immortality. এই বইয়ে লেখক দেখালেন পদার্থবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। বইটি সম্পর্কে New York Times বলছে, A thrilling ride to the for edges of modern physics, সায়েন্স পত্রিকা বলছে Tipler একটি মাস্টারপিস লিখেছেন। আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই, পদার্থবিদ্যা দিয়ে তা-ই বলছেন।

লেখকের পরিচয় তিনি Tulane বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স।

সমকালীন পদার্থবিদরা স্বীকার করেছেন যে Tipler-এর বইতে পদার্থবিদ্যার কোনো সূত্রের ভুল ব্যবহার নেই। তবে...।

আমি তবের ব্যাখ্যায় গেলাম না। বইটিতে ওমেগা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি। আমি নিজে 'ওমেগা পয়েন্ট' নাম দিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখছি। ওমেগা পয়েন্টে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলতে পারিনি।

কল্পনা করা যাক আমগাছের মগডালে একটি পাকা আম। বানর আমটি পাড়তে পারছে না কারণ ডাল অত্যন্ত সরু। ডাল ভেঙে পড়ে সে আহত হবে। বানরের হাতে তখন যদি একটি লাঠি দেওয়া

হয়, সে লাঠি দিয়ে আম পাড়ার চেষ্টা করবে। তিনবার চেষ্টা চালিয়ে চতুর্থবার সে ডাল ফেলে চলে যাবে। মানুষ সেটা করবে না। আম না পাড়া পর্যন্ত সে লাঠি দিয়ে চেষ্টা করেই যাবে। লাঠির সঙ্গে আরেক লাঠি যুক্ত করবে। মানুষ রণে ভঙ্গ দেবে না।

অমরত্বের সন্ধানে মানুষ কখনোই রণে ভঙ্গ দেয়নি। তাদের প্রধান চেষ্টা ছিল মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা। শুরুতে ভাবা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে শারীরিক মৃত্যুঘড়ি বেজে ওঠে; তখন মৃত্যু প্রক্রিয়া শুরু হয়। জরা আমাদের গ্রাস করতে থাকে।

এখন বলা হচ্ছে, মৃত্যুঘণ্টা বা মৃত্যুঘড়ি বলে কিছু নেই। মানবদেহ অতি আদর্শ এক যন্ত্র। যন্ত্রের দিকে খেয়াল রাখলেই জরা আমাদের গ্রাস করবে না। বায়োলজিস্টরা এখন বলছেন, জরার মূল কারণ টেলোমারস (Telomeres) কণিকাগুচ্ছ। এরা DNA-র অংশ, থাকে ক্রমোজমের শেষ প্রান্তে। যখনই কোনো জৈব কোষ ভাঙে, টেলোমার কণিকাগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ছোট হতে থাকে। যখন জৈব কোষের আর কোনো টেলোমার থাকে না তখনই শুরু হয় জরা। আমরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকি।

বায়োলজিস্টরা পরীক্ষা শুরু করলেন জরাগ্রস্ত ইঁদুর নিয়ে। তাদের দেওয়া হলো টেলমোরজ (Telomerase) এনজাইম। দেখা গেল, তাদের জরা প্রক্রিয়াই শুধু যে বন্ধ হলো তা না, তারা ফিরতে লাগল যৌবনের দিকে।

এই পরীক্ষা মানুষের ওপর করার সময় এসে গেছে। যে-কোনো দিন পত্রিকা খুলে জরা বন্ধ করার খবর পড়া যাবে। গৌতম বুদ্ধ এ সময় থাকলে আনন্দ পেতেন। তিনি জরা এবং মৃত্যু নিয়ে অস্থির ছিলেন। নির্বাণে মানুষ জরা এবং মৃত্যু মুক্ত হবে এটা তাঁর শিক্ষা।

তারপর একি! সত্যি কি মৃত্যুকে ঠেকানো যাচ্ছে? আমার হাতে টাইম পত্রিকার একটি সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১১) প্রচ্ছদ কাহিনী ২০৪৫, The year man Becomes Immortal. প্রচ্ছদ কাহিনী পড়ে জানলাম, ২০৪৫ সালে মানুষ অমর হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে আসছে নতুন নতুন টেকনোলজি। টেকনোলজির বৃদ্ধি ঘটছে এক্সপোনেনশিয়েলি। ২০৪৫-এর কাছাকাছি মানুষ Singularity-তে পৌঁছাবে। সিঙ্গুলারিটি শব্দটি এসেছে Astro Physics থেকে। এর অর্থ এমন এক বিন্দু, যেখানে পদার্থবিদ্যার সাধারণ সূত্র কাজ করবে না। এর মানেই অমরত্ব। ইচ্ছামৃত্যু ছাড়া মৃত্যু নেই। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ২০৪৫ সাল পর্যন্ত আমি এমনিতেই টিকছি না। অমরত্ব

পাওয়া এই জীবনে আর হলো না। পৃথিবীতে ফিনিক ফোটা জোছনা আসবে। শ্রাবণ মাসে টিনের চালে বৃষ্টির সেতার বাজবে। সেই অপূর্ব অলৌকিক সংগীত শোনার জন্যে আমি থাকব না। কোনো মানে হয়?

আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

বঙ্গদেশের রানাঘাটে আইনস্টাইন বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। বিষয়বস্তু 'On the unity and University of Forces.' দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন রানাঘাটে গিয়েছেন বাংলা সিনেমার নায়িকা, নৃত্যগীতে পটু, অসামান্য রূপবতী ইন্দুবালা দেবী। তিনি স্থানীয় বাণী সিনেমা হলে নৃত্য পরিবেশন করবেন। আইনস্টাইনের বক্তৃতার জায়গা মিউনিসিপ্যালটি হল। যা হওয়ার তা-ই হলো। বাণী সিনেমা হল দর্শকে পরিপূর্ণ। মিউনিসিপ্যালটি হলে আইনস্টাইন এবং গণিতের অধ্যাপক রায়বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ছাড়া কেউ নেই। হতাশ নীলাম্বর বাবু আইনস্টাইনকে বাণী সিনেমা হলে ইন্দুবালার নাচ দেখাতে নিয়ে গেলেন। পরদিন পত্রিকায় ছাপা হলো, 'বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাওয়ার পথে রানাঘাট মিউনিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।'

এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি। মহান কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের সারাংশ বলা হলো। গল্পটি 'উপলখণ্ড' গল্প সংকলনে আছে। পৃথিবীর কোনো দেশের লেখকরাই বিজ্ঞানীদের বিষয়ে উৎসাহিত বোধ করেননি। একমাত্র আইনস্টাইনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল সবার কৌতূহলে নাড়া জাগানোর।

সেদিন তেজগাঁও থেকে মালিবাগে যাচ্ছি। চোখে পড়ল বিশাল বিলবোর্ড। সেখানে রিয়েলএস্টেটের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে আইনস্টাইনের ছবি। ছবির নিচে লেখা 'জমি কিনতে বুদ্ধিমান হোন' জাতীয় কথা। বুদ্ধিমান হিসেবে আইনস্টাইনের ছবি ছাপা হয়েছে।

আমার শৈশবে আইনস্টাইনকে নিয়ে একটি লেখা পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। সচিত্র লেখা। আইনস্টাইন বেহালার বাঙ্ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমেছেন এমন ছবি। কাহিনীর বিষয়বস্তু ছিল বেলজিয়ামের রানির আমন্ত্রণে তিনি ট্রেনে করে বেলজিয়াম গিয়েছেন। ট্রেন থেকে নেমে দেখেন তাঁকে নিতে কেউ আসেনি। তিনি একাই হেঁটে হেঁটে রওনা হলেন। বেলজিয়ামের রানি

আইনস্টাইনকে নিতে দলবল পাঠিয়েছিলেন ঠিকই। তারা প্রথম শ্রেণীর কামরা খুঁজেছে। তারা কেউ ভাবেনি আইনস্টাইন সাধারণ শ্রেণীতে চলে আসবেন।

আমাদের শৈশবে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নিয়ম ছিল দেয়ালে মহাপুরুষদের ছবি টানানো। বালক-বালিকারা যেন অল্প বয়সেই মহাপুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের সিলেটের মীরাবাজারের বাসায় মহাপুরুষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ছাড়া আর যে দুজন ছিলেন তাঁদের একজন আইনস্টাইন অন্যজন জর্জ বার্নড শ। আইনস্টাইনের ছবি আমাকে আকর্ষণ করেনি তবে জর্জ বার্নড শ'র ছবিটি মুগ্ধ করেছিল। ছবিতে বৃদ্ধ এক বুড়োকে লাঠি হাতে তেড়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল।

আইনস্টাইনের প্রথম পরিচয় পাই আমার বয়স যখন আঠারো, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র। অধ্যাপক আলি নওয়াব ক্লাসে পড়াচ্ছেন ভিসকোসিটি। একপর্যায়ে ভিসকোসিটির ইকোয়েশন বোর্ডে লিখে বললেন, এটা আইনস্টাইন ইকোয়েশন। উনি বের করেছেন। আমি অবাক! যে মহা বিজ্ঞানী রিলেটিভিটি বের করেছেন তিনি সামান্য ভিসকোসিটি সমীকরণও বের করেছেন।

পরের বছর পড়লাম আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিক অ্যাফেক্ট। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

ফটো ইলেকট্রিক অ্যাফেক্ট বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হলো না। সূত্রটি জটিল অঙ্কে মোড়ানো না। আলোর কণিকা ধর্ম কিছুটা এলোমেলো ঠেকলেও ছাত্র হিসেবে আমরা আলোর দ্বৈত সত্তার বিষয়টা ততদিনে জানি।

আমার প্রধান আগ্রহ তখন আইনস্টাইনের ভুবন কাঁপানো থিওরি অব রিলেটিভিটি বিষয়ে জানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার কোনো শিক্ষক কি বিষয়টি বোঝাতে পারবেন? একজন নিশ্চিতভাবে পারতেন, অধ্যাপক সত্যেন বসু। তিনি তো বেঁচে নেই। পদার্থবিদ্যার ছাত্র আমার অতি ঘনিষ্ঠজন আনিস সাবেত আমাকে জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার মাত্র একজন শিক্ষক থিওরি অব রিলেটিভিটি বোঝেন তাঁর নাম এ এম হারুন-অর-রশিদ। আনিস ভাই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। স্যার আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, থিওরি অব রিলেটিভিটি বুঝতে চাও কেন?

আমি মাথা চুলকালাম। আসলেই তো কেন বুঝতে চাই? থিওরি অব রিলেটিভিটি বুঝে আমি কি করব?

স্যার বললেন, খুব সাধারণভাবে বিষয়টা বোঝানো যায়। মনে কর তুমি তোমার বান্ধবীর সঙ্গে দুই ঘণ্টা কাটিয়েছ। তোমার কাছে মনে হবে মাত্র দুই মিনিট কাটিয়েছ। আবার অতি বিরক্তির এক বৃদ্ধের সঙ্গে দুই মিনিট কাটালে তোমার কাছে মনে হবে দুই ঘণ্টা কাটিয়েছে। তবে এইসব ব্যাখ্যা কোনো কাজের ব্যাখ্যা না। এইসব হচ্ছে মানসিক ঘটনা। থিওরি অব রিলেটিভিটি কোনো মানসিক ব্যাপার না। প্রকৃত বিজ্ঞান। তুমি পরে এসো আমার কাছে আমি চেষ্টা করব তোমাকে বিষয়টা বোঝাতে। তোমার আগ্রহ দেখে আমি নিজেও আগ্রহ বোধ করছি এই বিষয়ে বাংলায় একটা বই লেখার জন্যে।

তাঁর কাছে পরে আমার আর যাওয়া হয়নি। আমি তাঁকে আমার লেখা একটা সায়েন্স ফিকশন উৎসর্গ করে (ফিহা সমীকরণ) আমেরিকার নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম।

পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপে আমি তখন দিশাহারা। মাথা থেকে আইনস্টাইনের ভূত নেমে গেছে। সহজ বাংলায়, 'কেঁথা পুড়ি থিওরি অব রিলেটিভিটির, আগে কোর্স ওয়ার্ক সামলাই। এমন অবস্থায় নোটিশ বোর্ডে দেখি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিজ্ঞানী আসছেন নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। তিনি এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেবেন। বিষয়বস্তু মহান আইনস্টাইনের মহান ভুল (Great Einestines Great Mistake)। আমি বক্তৃতা শুনতে অডিটরিয়ামে উপস্থিত হলাম। (দুঃখিত আমি অধ্যাপকের নাম ভুলে গেছি। আলজেমিয়ার্স মনে হয় হয়েই যাচ্ছে।)

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি বেশি জ্ঞানী মানুষদের বক্তৃতা ভালো হয় না। তাঁরা শ্রোতাদের তাঁদের মতোই ধীমান মনে করেন। এমন বক্তৃতা দেন যা শ্রোতাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। শুধু চুল স্পর্শ করে। মস্তিষ্কে ঢুকতে পারে না।

এই অধ্যাপক গল্প বলার মতো করে বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমেই প্রজেক্টরে পৃথিবী নামক গ্রহের ছবি দেখানো হলো। সেখানে একটি সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডে লেখা_এই গ্রহে আইনস্টাইন জন্মেছিলেন।

অধ্যাপক হাসিমুখে বললেন, যদিও বলা হয় আইনস্টাইন পৃথিবী নামক গ্রহে জন্মেছেন আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় আইনস্টাইন একজন এলিয়েন কারণ তাঁর চিন্তার ধারাটাই

এলিয়েনদের মতো। আলোর গতি এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ডে। আইনস্টাইন চিন্তা করলেন তিনি নিজেও আলোর গতিতে আলোর পাশাপাশি ছুটে যাচ্ছেন। তখন তিনি কি দেখবেন? এখন আপনারাই বলুন চিন্তার ধারা এলিয়েন নয়?

আমরা প্রবল হাততালি দিলাম। এক ঘণ্টার বক্তৃতা এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে শেষ হলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধ। বক্তৃতায় আইনস্টাইনের মহান ভুল নিয়ে একটি কথাও বলা হলো না। শ্রোতাদের একজন এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই অধ্যাপক বললেন, আইনস্টাইনের মহান ভুল হচ্ছে তিনি অনেক আগে থিওরি অব রিলেটিভিটি এবং স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সব পদার্থবিদের মুক্তচিন্তা আটকে দিয়েছেন। আইনস্টাইন পৃথিবীতে না এলে পদার্থবিদরা নানা দিকে অন্ধের মতো হাতড়াতে থাকতেন। এতে অনেক কিছু বের হয়ে আসতো। তাড়াহুড়া করে থিওরি অব রিলেটিভিটি বের করে ফেলাই হলো আইনস্টাইনের মহান ভুল।

আইনস্টাইন তাঁর সারা জীবনে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে গেছেন। একটি উল্লেখ করি।

"সময় মানুষ তার নিজের সুবিধার জন্য কল্পনা করেছে কারণ মানুষ কখনোই চায়নি তার জীবনের সব ঘটনা একসঙ্গে ঘটে যাক।"

কথাগুলো অস্পষ্ট হেয়ালির মতো লাগছে না? আইনস্টাইন অনেক হেয়ালি কথা বলে গেছেন যদিও তিনি বিশ্বাস করেছেন বিজ্ঞান সমস্ত হেয়ালির ঊর্ধ্বে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি_ঈশ্বর পাশা খেলেন না। (God does not play dice.)

পাদটিকা

আইনস্টাইনকে নিয়ে পৃথিবীজুড়েই নানা গল্পগাথা প্রচলিত। এর মধ্যে একটি উল্লেখ করছি।

বালক আইনস্টাইন ছিলেন হাবাগোবা। চার বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কোনো কথা বলেননি। তাঁর বাবা-মা ধরে নিলেন আইনস্টাইন বাকপ্রতিবন্ধী। এক দুপুরে লাঞ্চ খেতে বসে আইনস্টাইন প্রথম কথা বললেন। স্যুপের বাটি সরিয়ে তিনি বললেন, স্যুপটি ঠাণ্ডা।

আইনস্টাইনের মা হতভম্ব গলায় বললেন, তুমি কথা বলতে পার?

আইনস্টাইন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তার মা বললেন, এতদিন কথা বলনি কেন?

আইনস্টাইন বলেন, এতদিন স্যুপ ঠাণ্ডা ছিল না। কথা বলার প্রয়োজন হয়নি।

জুকারবার্গের দুনিয়া

আমার এক শিশুশিল্পীর নাম রুদ্র। এখন সে শিশুশিল্পী থেকে বালক-শিল্পী হয়েছে। বয়স বেড়ে এগারো হয়েছে। একদিন সে আমাকে টেলিফোন করে বলল, 'স্যার আংকেল (শিশুশিল্পীরা অন্যদের মতো আমাকে স্যার ডাকে না। স্যার আংকেল ডাকে), আপনি কি ফেসবুকে আছেন?'

থতমত খেয়ে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, না। তুমি কি আছ?

রুদ্র উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ।' আপনি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালেই আপনাকে ফ্রেন্ড বানাব।

রুদ্রকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়নি। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর প্রথম শর্ত ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট থাকা, তা আমার নেই। তবে সুখের ব্যাপার, আমার নামে সাতটি অ্যাকাউন্ট আছে। এই অ্যাকাউন্টগুলো আমার হয়ে সামাজিক সৌহার্দ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সৌহার্দ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড হলো, মিথ্যা হুমায়ূন আহমেদ তরুণী মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সাহিত্য আলোচনা করছেন। তাদের সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিস্নান এবং জ্যোৎস্নাস্নানের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

এক তরুণী সেই হুমায়ূন আহমেদকে স্যার সম্বোধন করায় তিনি রাগ করে লিখলেন, 'আমার মনের বয়স বাড়েনি। আমি চিরতরুণ। তুমি আমাকে ভাইয়া ডাকবে, কেমন?'

ফেসবুকের নামে আমরা কি ধীরে ধীরে এক অলীক জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি না? মিথ্যাকেই সত্য ভাবছি। এক ধরনের ডিজিটাল রোগের শিকার হচ্ছি। রোগটির নাম ডিলিউসন।

জীবনীগ্রন্থ সাহিত্যের একটি ধারা। জীবনীগ্রন্থকে বলা হয়_'অতি উত্তমরূপে ধোলাইকৃত আত্মকাহিনী।' ফেসবুককে তাহলে কী বলা হবে? ভানের কথামালা?

অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক মাজহারের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তাঁর একটি ছবি আছে। ছবিতে মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলের এক যুবা পুরুষ। চুলের স্তূপ দেখলে যেকোনো নাপিত উল্লসিত হবে। সমস্যা হচ্ছে, মাজহারের মাথায় এখন অল্প কয়েকগাছি চুল। আধা ঘণ্টার মধ্যে চুলগুলো গুনে ফেলা যাবে।

আমার পরিচিত একজনের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পড়ে জানলাম, সে অবিবাহিত। তার শখ দেশভ্রমণ। পৃথিবীর নানা দেশ সে ভ্রমণ করেছে। চমৎকার একটি গাড়িতে হেলান দিয়ে সে একটি ছবি আপলোড করেছে। নিচে লেখা_আমার নতুন গাড়ি। যার কথা বলা হচ্ছে সে দুই সন্তানের জনক। তার বিদেশভ্রমণ আগরতলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার কোনো গাড়ি নেই।

এসব ফেসবুকের মূল উদ্দেশ্য কী? আমার কাছে পরিষ্কার না। স্বামী ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন, স্ত্রী খুলবেন। দুজন দুজনের বন্ধু হবেন এবং ফেসবুকের মাধ্যমে গল্পগুজব করবেন?

আমরা শহরবাসী পাশের ফ্ল্যাটের মানুষজনকে চিনি না এবং তাদের চেনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করি না। আমাদের আগ্রহ ফেসবুকের বন্ধু সংগ্রহে। আজব অবস্থা না? নতুন নতুন বন্ধু হচ্ছে, বাতিল হয়ে যাচ্ছে, আবার হচ্ছে।

তরুণ ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইবে_ফ্রয়েড সাহেবের তাই অভিমত। বাস্তবে বান্ধবী খোঁজার চেয়ে ফেসবুকে বান্ধবী খোঁজা ভালো। বিপদের আশঙ্কা কম। মেয়েরা আবার অপরিচিত ছেলেদের বন্ধু তালিকায় আনার চেয়ে মেয়েদের এই তালিকায় আনতে আগ্রহী। এখন উপায়?

উপায় আছে। ছেলেরা মেয়ে সেজে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবে। এতেও যদি কিছু হয়।

উদাহরণ দেই_মেহের আফরোজ শাওনের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে। একটি মেয়ে তার বন্ধু হওয়ার জন্য আবেদন করল, মেয়েটির চেহারা অপূর্ব সুন্দর। মায়াময় চোখ। মেয়েটিকে বন্ধু তালিকায় নেওয়ার পর শাওন আবিষ্কার করল ছবিটি এক বিখ্যাত তামিল অভিনেত্রীর। বলাই বাহুল্য, তামিল অভিনেত্রীর পেছনে লুকিয়ে আছে তরুণী সঙ্গলিপ্সু বিকারগ্রস্ত কোনো পুরুষ।

ওয়েবসাইট (ফেসবুকও ওয়েবসাইট) যে নোংরামি ছড়ানোর ডিজিটাল উপায়_তা এখন সবাই নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। সেলিব্রেটিদের নোংরা ছবি ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। সমকাল পত্রিকায় পড়লাম অ্যামেজিং ডটকম নামের ওয়েবসাইটের অ্যামেজিং আড্ডা বাংলাদেশের সেলিব্রেটির নোংরা ছবির আখড়া। যৌনকর্মকাণ্ড অতি নিজস্ব একটি ব্যাপার। যেহেতু এই পত্রিকায় নতুন প্রাণের সৃষ্টি হয় কাজেই প্রক্রিয়াটি পবিত্রও বটে। পবিত্র হলেও অবশ্যই গোপন। এমন একটি বিষয়ের ভিডিও কিভাবে হচ্ছে, কে জানে! তবে যেভাবে হচ্ছে, তাতে মনে হয় এক সময় নোংরা ভিডিও আপলোড করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে। একজন আরেকজনকে বলবে, আমার নতুন

একটা ভিডিও ক্লিপিং ওয়েবসাইটে এসেছে। দেখেছিস? না দেখলে আমার কাছে মাস্টার কপি আছে।

শাওনকে বললাম, ফেসবুকের ভালো বিষয় কোনটা বলে তোমার ধারণা?

সে বলল, ছোটবেলার বন্ধুদের আমি ফেসবুকে খুঁজে পাই। ওদের ছবি দেখি, ওদের ছেলেমেয়েদের ছবি দেখি। এত ভালো লাগে!

আমি বললাম, তোমার বন্ধুর তালিকায় কতজন আছে?

শাওন বলল, খুব কম।

খুব কম কত?

ছোটবেলার বন্ধু আর নতুন মিলিয়ে চার হাজার সাত শ।

আমি 'খাইছে রে' বলে আর্তচিৎকার করলাম।

শাওন বিরক্ত গলায় বলল, এমন করলে কেন? বন্ধুর সংখ্যা যত বেশি হবে তত ভালো। তুমি তোমার কোনো একটা চিন্তা বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

ভুল চিন্তা যদি হয়?

ভুল চিন্তা ছড়াবে। তবে ভুল চিন্তা ধরা পড়বে। বন্ধুরাই ধরিয়ে দেবে। শুদ্ধ চিন্তা প্রবাহিত হবে। ফেসবুকের মাধ্যমে অতি দ্রুত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

কথাটা আমাকে মানতে হলো। গত ইলেকশনের সময় ফেসবুকের কারণে রব উঠেছিল_'যুদ্ধাপরাধীদের ভোট দেবেন না।' ঘটনা সে রকম ঘটেছে। বর্তমান আরব বিশ্বের দিকে তাকালে ফেসবুকের ক্ষমতা টের পাওয়া যায়।

ফেসবুকের মতো নিরীহ একটি সফটওয়ারে অ্যাটম বোমা লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর সব রাজনীতিবিদের সতর্ক হওয়ার সময় এসে গেছে।

ফেসবুকের জনক জুকারবার্গকে অভিনন্দন।

পাদটিকা

আমাকে নিয়ে একটি মজার ওয়েবসাইট আছে। নাম_হুমায়ূন আহমেদকে না বলুন (http://www.facebook.com/group.php?gid=129447467609). একদিন শাওন ওয়েবসাইট খুলে আমাকে দেখাল। আমি প্রভূত আনন্দ পেলাম। মনের আনন্দে সবাই আমাকে গালাগাল করে যাচ্ছে। ওয়েবসাইট দেখে জানলাম, আমার মৃত্যু বাংলাদেশের জন্য একটি শুভ ঘটনা বলে বিবেচিত হবে।

মৃত্যুতেও দেশের জন্য কিছু করতে পারব এটাও তো মন্দ না। কয়জনের সে সৌভাগ্য হয়?

মুখোশপরা জাদুকর

AXN নামের টিভি চ্যানেলের একটি অনুষ্ঠান আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে কিন্তু খুব মন খারাপ করে দেখি। অনুষ্ঠানে একজন মুখোশপরা জাদুকর উপস্থিত হন এবং নির্বিকার ভঙ্গিতে জাদুবিদ্যার গোপন কৌশল একের পর এক ফাঁস করতে থাকেন। স্টেজে যে জাদু দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি, তার রহস্য জেনে মনটাই ভেঙে যায়। অসাধারণ জাদুর পেছনের কৌশল এত সাধারণ!

মুখোশপরা জাদুকরের অনুষ্ঠান দেখছি, হঠাৎ ডিশের লাইনে কী যেন সমস্যা হলো। টেলিভিশনের পর্দা ঝিরঝির করতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো, আরে তাই তো, এই মুহূর্তে আমি দেখছি প্রকৃতির অতিরহস্যময় এক জাদু। টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-এর পরবর্তী মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন (After Glow)। অঙ্কবিদ জর্জ গ্যামো ১৯৪০ সালে অঙ্কের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন সত্যি সত্যি যদি বিগ ব্যাং হয়, তাহলে তার আফটার গ্লো চারদিকে ছড়িয়ে থাকা উচিত। মহাবিশ্ব যতই প্রসারিত হবে এর তাপ ততই কমবে।

নিউ জার্সির বেল ল্যাবরেটরির দুই তরুণ রেডিও অ্যাসট্রোনমার নতুন ধরনের হর্ন অ্যান্টেনা নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা পড়ে গেলেন বেশ ঝামেলায়_অ্যান্টেনা যেদিকে ধরা যায় সেদিক

থেকেই হিস হিস শব্দ আসে। নিশ্চয়ই অ্যান্টেনার সমস্যা। তাঁরা নানা চেষ্টা করলেন হিসিং শব্দ বন্ধ করার। কিছুতেই কিছু হয় না। আসলে তারা দেখছিলেন জর্জ গ্যামোর ভবিষ্যদ্বাণী, বিগ ব্যাং-পরবর্তী দীপ্তি। যার তাপ ৩ ডিগ্রি কেলভিন। অ্যাসট্রো পদার্থবিদ্যায় এই বিশাল আবিষ্কারের জন্য

তাঁদের দেওয়া হলো পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার। বিজ্ঞানী দুজনের একজনের নাম আরনো পেনজিয়ার্স, অন্যজনের নাম রবার্ট উইলসন।

বিগ ব্যাং বিষয়টা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আমাদের প্রায় সবারই আছে। সৃষ্টির শুরুটা হয় এখানে। বর্তমান দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সবটাই শুরুতে একটি বিন্দুতে আটকে ছিল (অ্যাসট্রো ফিকিক্সের ভাষায় ংরহমঁষধৎরঃু)। হঠাৎ অকল্পনীয় গতিতে বিন্দু বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল।

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফে সৃষ্টির শুরুর ঘটনা ঠিক এভাবেই উল্লেখ করা আছে। সুরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে_'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে সব আকাশ এবং ভূমণ্ডল একটি একক ছিল এবং আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করলাম?' (২১:৩০)।

বিজ্ঞান একদিকে থাকুক, ধর্ম অন্যদিকে থাকুক। এ মুহূর্তে দুটিকে মেলানোর কিছু নেই। বিগ ব্যাং-এ ফিরে যাই। বিগ ব্যাং-এর পরপরই ফুটন্ত অগি্নগোলক কণার গতি ছিল আলোর গতির চেয়েও অনেক বেশি। তা কী করে সম্ভব? আমাদের আইনস্টাইন তো বলে গেছেন আলোর গতি ধ্রুবক। সেকেন্ডে এক লাখ ৮৬ হাজার মাইল থেকে বেশি কখনো হতে পারবে না। আইনস্টাইনের 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' এবং 'স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি'র একটি আবশ্যকীয় শর্ত আলোর ধ্রুব গতি। সমস্যাটা কোথায়?

আইনস্টাইন এই সমস্যা জানতেন। পদার্থবিদ্যা যখন নিউটনকে ছাড়িয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় চলে গেল, তখনই অতি অদ্ভুত কারণে আইনস্টাইন শঙ্কিত বোধ করলেন। সম্ভাবনার বিজ্ঞানে তাঁর আস্থা ছিল না। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় যেকোনো ঘটনার জন্যই ঙনংবৎাবৎ বা দর্শক লাগবে। ঙনংবৎাবৎ ছাড়া ঘটনা কী, নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। আইনস্টাইন এতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আমি আকাশের চাঁদের দিকে না তাকালে কি আকাশে চাঁদ থাকবে না?

এই মহান বিজ্ঞানী ধরে নিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় সর্বনাশের ঘণ্টা বাজতে বাধ্য। কারণ, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা আলোর চেয়ে বেশি গতিশীল বস্তু/শক্তিতে বিশ্বাসী। তা হতে পারে না। কারণ, আলোর গতি ধ্রুব। হায়রে কপাল! আধুনিক ল্যাবরেটরিতে আলোর চেয়েও বেশি গতির সন্ধান পাওয়া গেল। ভুবনখ্যাত বাংলা ভাষাভাষী লেজার বিজ্ঞানী মণি ভৌমিকের ভাষ্য_'বিশেষ ধরনের ক্রিস্টালের উপর তীব্র লেজার বিম ফেলে বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন একজোড়া যমজ ফোটন। যমজ ফোটন বলা হয় এই কারণে যে এদের মধ্যে থাকে কিছু পারস্পরিক সাধারণ গুণ।

বিজ্ঞানীরা এবার যমজ ফোটন দুটিকে বিপরীত দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এই দুটি ফোটনের কোনো একটির মধ্যেও ছিল না এমন কোনো প্রোপার্টি বা প্রধান ধর্ম, যা তাদের নিজস্ব। ওদের প্রতিটি প্রোপার্টি যুগপৎ সহবাস করছে দুটির মধ্যেই। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হলো, যেই আমরা ওই যমজের একটির মধ্যে কোনো বিশেষ প্রোপার্টি মাপছি, যমজের অন্যটি মুহূর্তেই সাড়া দিচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি প্রপার্টি দেখিয়ে। মহাবিশ্বের দুই বিপরীত দিকে যত দূরেই পাঠানো হোক, ওই যমজ ফোটনকে তারা মুহূর্তেই পরস্পরের প্রতি এভাবে সাড়া দিবে। এবং সাড়া দিবে মহাজাগতিক স্পিড লিমিট আলোর গতির চেয়েও অসামান্য গতিতে। বহু পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবারই পাওয়া গেছে এই ফল।'

এই দুটি ফোটন কণা কোনো না কোনোভাবে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। কিভাবে যুক্ত? মনে করা যাক যমজ ফোটন কণার একটি পৃথিবীতে অন্যটি এনড্রোমিডা ছায়াপথে। এদের ভেতরের দূরত্ব ২.৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। কিন্তু তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

কল্পনাকে আরো ছড়িয়ে দিয়ে কি বলতে পারি যে আমরা সমগ্র মহাবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত? শুধু যে এখন যুক্ত তা-ই নয়, অতীতেও যুক্ত ছিলাম, ভবিষ্যতেও যুক্ত থাকব। বিজ্ঞানে সময় বলে তো কিছু নেই।

যখন বিগ ব্যাং হলো তখনো আমরা উপস্থিত_এই ভাবনাটা কেমন?

মুখোশপরা জাদুকর জাদুর গোপন কৌশল বলে দিচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন মুখোশপরা পদার্থবিদ্যা। আমরা তাদের অপেক্ষায় আছি।

পাদটীকা

শেষটায় আইনস্টাইন হেঁয়ালির কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের আবিষ্কারও কিন্তু কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার চেয়ে কম হেঁয়ালিপূর্ণ ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন সময় ও মহাশূন্য Absolute না। দুটোই নমনীয়।

রেলগাড়ি ঝমাঝম

আমার শিশুবেলার প্রধান খেলা ছিল 'রেলগাড়ি খেলা'। বাসার কাঠের চেয়ারগুলোকে একটির পেছনে আরেকটি সাজাতাম। প্রথম চেয়ারটায় আমি গম্ভীর মুখে বসে ট্রেনের চাকার শব্দের অনুকরণে 'ঝিকঝিক ঝিকঝিক' করতাম।

শৈশবের অতি আনন্দময় সময় আলাদা করতে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলব_ট্রেনে করে দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি যাওয়া। তখনকার ট্রেনের ইঞ্জিন ছিল কয়লার। জানালার পাশে বসে মাথা বের করলে অবধারিতভাবে চোখে পড়ত ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে আসা কয়লার টুকরা। কাজেই বড়দের প্রধান চেষ্টা ছিল শিশুদের জানালা দিয়ে মাথা বের করতে না দেওয়া। বড়দের সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমি শুধু যে মাথাই বের করতাম তা না, শরীরের অর্ধেকটা জানালা দিয়ে বের করে রাখতাম। বড় মামার দায়িত্ব ছিল শক্ত করে আমার পা চেপে ধরে রাখা। চিরকুমারের মতো চিরবেকার বড় মামা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। আমাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতেন। অবসরে কবিতা ও জারিগান লিখতেন। কবিতাগুলোতে সুর বসিয়ে গান বানিয়ে শিশুমহলে দারুণ চাঞ্চল্য তৈরি করতেন।

ট্রেন ভ্রমণে ফিরে যাই। শিশুবেলা কাটিয়ে আমি বালকবেলায় পড়লাম, রেলগাড়ির প্রতি আকর্ষণ মোটেই কমল না। বরং বাড়ল। আমার দুষ্টুমি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ট্রেন-ভ্রমণে সব সময় আমাকে বসতে হতো বাবার পাশে। বাবা ছিলেন নীরব শিক্ষক। তিনি খুব কায়দা করে নানান তথ্য তাঁর বালকপুত্রের মাথায় ঢোকাতেন। যেমন_টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা কোন পাখির কী নাম। কেন রাস্তায় ট্রেন চলতে পারে না, ট্রেনের চলার জন্য রেললাইন লাগে।

এক ট্রেন-ভ্রমণে অদ্ভুত তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর বালকপুত্রকে চমকে দিলেন। তিনি বললেন, ট্রেন কত মাইল স্পিডে যাচ্ছে বলতে পারবি?

আমি বললাম, না।

বাবা বললেন, খুব সোজা। ট্রেলিগ্রাফের ২৭টা (সংখ্যায় ভুল হতে পারে, এখন মনে পড়ছে না) খাম্বার দূরত্ব হলো এক মাইল। তুই ঘড়ি হাতে নিয়ে দেখবি ২৭টা খাম্বা পার হয়ে যেতে কত সময় লাগে। সেখান থেকে বের করবি ট্রেন ঘণ্টায় কত মাইল বেগে যাচ্ছে।

এর পর থেকে আমার প্রধান কাজ হলো ঘড়ি হাতে বসে টেলিগ্রাফের খাম্বা গুনে ট্রেন কত মাইল স্পিডে যাচ্ছে তা বের করা। বালক বয়সে তিনি বিশাল এক বিস্ময় আমার ভেতর তৈরি করে আমাকে অভিভূত করলেন। আমি চেষ্টা করতে থাকলাম এই জাতীয় কোনো বিস্ময় আমার পুত্র নিষাদের ভেতর তৈরি করতে পারি কি না। সমস্যা হচ্ছে, নিষাদের বয়স চার। এ বয়সের শিশুরা সব সময় বিস্ময়ের ভেতর থাকে। তাদের আলাদা করে বিস্মিত করা যায় না। হঠাৎ সুযোগ হয়ে গেল। আমি শ্রীলঙ্কায় ট্রেনে করে কলম্বোর দিকে যাচ্ছি। পুত্র নিষাদকে মনে হচ্ছে আমার শৈশবের ফটোকপি। ট্রেন ভ্রমণের আনন্দে আমার মতোই উদ্বেলিত। আমি তাকে বললাম, বাবা, মন দিয়ে শোনো ট্রেনের চাকা কী বলছে?

সে কিছুক্ষণ চাকার শব্দ শুনে বলল, জানি না তো কী বলছে?

আমি বললাম, ট্রেনের চাকা তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম বলছে। চাকা বলছে_নিষাদ-নিনিত, নিষাদ-নিনিত। নিষাদ-নিনিত, নিষাদ-নিনিত।

নিষাদ আবারও কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ বলছে তো!

পাঠকদের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, তাঁরা জানেন যেকোনো ছন্দময় শব্দ ট্রেনের চাকার সঙ্গে মিলবে। পুত্র নিষাদ ব্যাপারটা জানে না। সে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। সে বলল, বাবা, শ্রীলঙ্কার ট্রেন আমার নাম কিভাবে জানল?

আমি বললাম, সব ট্রেন তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম জানে। বাংলাদেশের ট্রেনও জানে।

বাংলাদেশে ফিরে সে আবার ট্রেনে চাপল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আনন্দধ্বনি। সে অবাক হয়ে বলল, ট্রেন বলছে নিষাদ-নিনিত, নিষাদ-নিনিত।

আচ্ছা, আমি কি ছোট একটি বাচ্চার সঙ্গে প্রতারণা করলাম না? এই শিশুটি একদিন বড় হয়ে জানবে ট্রেন তার নামে গান করে না। সে কি তখন নিজেকে প্রতারিত মনে করবে না? পৃথিবীর সব দেশেই নানান ভাবে শিশুরা প্রতারিত হয়। পড়ে যাওয়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে রাখলে ইঁদুর সুন্দর দাঁত উপহার দেয়। তারা বিশ্বাস করে, সান্তাক্লজ এসে তাদের উপহার দিয়ে যায়। শিশুদের কাছে একসময় প্রতারণা ধরা পড়ে, তারা তখন (আমার ধারণা) বড়দের ক্ষমা করে দেয়।

আমরা বড়রাও প্রতারিত হই। প্রতারণা করেন রাজনীতিবিদরা। ইলেকশনের আগে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। বৈতরণী পার হওয়ার পর সব কিছুই ভুলে যান। বিস্মৃতি ব্যাধি হয়। এ ব্যাধি পাঁচ বছর থাকে। পাঁচ বছর পর রোগ সারে। আবার পূর্ণোদ্যমে পুরনো কথা বলতে থাকেন, আমরা আবারও প্রতারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। আমরা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বেলতলায় যাই। বেলতলায় যেতে আমাদের বড় ভালো লাগে।

আচ্ছা এ রকম হলে কেমন হয়_বাংলাদেশের সব মানুষ যদি ঠিক করে ভোট দিয়ে লাভ তো কিছু নেই, কাজেই এই নির্বাচনে আমরা কেউ ভোট দেব না। ইলেকশন হয়ে গেল, একটি ভোটও পড়ল না। তখন কী হবে? বাংলাদেশ কি সরকারবিহীন হয়ে পড়বে? আইন কী বলে?

পাদটীকা

'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ' নামে আমি একটি স্কুল দিয়েছি। আমি কল্পনায় যে সুন্দর স্কুল দেখি এই স্কুলটি সে রকম। চার বছর ধরে স্কুলটি চলছে। পাসের হার শতভাগ। ড্রপ আউট শূন্য। স্কুল দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন আসে, কিন্তু আমার এলাকার নির্বাচিত এমপি এবং মহিলা এমপি কেউই দুই মিনিটের জন্যও স্কুলে আসেননি। আমি কিছুদিন আগে একদল লেখক, কবি, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীকে স্কুলে নিয়ে গেলাম। আমার এলাকার এমপিদের অনুরোধ করে চিঠি পাঠালাম তাঁরাও যেন আসেন। দুজনের কেউই এলেন না। এমপিদের নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতে হয়। বললেই তো তারা সময় বের করতে পারেন না। টার্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখনো শুল্কমুক্ত গাড়ির ব্যবস্থা হলো না_এটা নিয়েও হয়তো ব্যস্ততা আছে।

'আমাদের সন্তানেরা থাকুক দুধে-ভাতে

আমাদের এমপিরা থাকুক ট্যাঙ্ ফ্রি গাড়িতে।'

অশরীরী সুর

দুই বছর আগের কথা (জানুয়ারি, ২০০৯)। লেখার টেবিলে বসেছি। টেবিলে A4 সাইজের কাগজ আছে, বলপয়েন্ট আছে, চায়ের কাপ এবং কাপের পাশে সিগারেটের প্যাকেট আছে। সবচেয়ে বড় কথা, মাথায় গল্প আছে। লিখতে বসে দেখি, কলম চলছে না। শরীরের যে মাসলগুলো আঙুল চালায়, তারা আড়ষ্ট।

বাসায় রবি নামের একটি কাজের ছেলে আছে, তার দায়িত্ব শাওনের কুকুরের দেখাশোনা করা। আমার অবস্থা দেখে সে কোলের কুকুর ফেলে ছুটে এল। অনেকক্ষণ হাতে ম্যাসাজ করল। আঙুল টেনে দিল। হাতের আড়ষ্ট ভাব দূর হলো না। নিষাদ তার মাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনন্দিত গলায় বলল, মা! বাবার একটা হাত নষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র শিশুরাই যেকোনো দুর্ঘটনায় আনন্দ পায়।

আমার পাশের ফ্ল্যাটে অন্যপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী মাজহার থাকে। আমার ডান হাত অচল শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সামনে বইমেলা। অন্যপ্রকাশের এখন কী হবে? মাজহার করিৎকর্মা মানুষ। আমার অবস্থা দেখে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। এক ঘণ্টারও কম সময়ে ফিরে এল। না, ডাক্তার নিয়ে আসেনি। সে এসেছে একটা মিনি ক্যাসেট রেকর্ডার নিয়ে। ক্যাসেট রেকর্ডার চার ঘণ্টা চলবে।

আমি হাতে না লিখে মুখে মুখে বলব। গল্প বা উপন্যাস রেকর্ড হয়ে যাবে। মাজহারের লোকজন ক্যাসেট প্লেয়ার বাজিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখে ফেলবে।

আমি চেষ্টা করলাম। একসময় লক্ষ করলাম, মূল গল্প থেকে সরে আবোলতাবোল কথা বলছি। ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করে দেওয়া হলো। বিকেলে গেলাম ডাক্তারের কাছে। তারা X-Rayসহ অনেক কিছু করল। ডাক্তাররা কিছু বের করতে পারল না।

কিন্তু আমি সমস্যা বের করে ফেললাম। মানসিক কোনো ব্যাপার ঘটেছে। ডান হাত দিয়ে আমি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে পারছি, কাগজে আঁকিবুঁকি করতে পারছি; কিন্তু লিখতে পারছি না। অর্থাৎ আমার মস্তিষ্ক চাইছে না যে আমি লিখি। মস্তিষ্ক চাইছে না বলেই সে হাতে লেখার কোনো সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না। এর চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ। মনকে নির্ভার করতে হবে। নুহাশপল্লীতে টানা কয়েক দিন থাকতে হবে। নুহাশপল্লীর বৃক্ষরাজি আমাকে সুস্থ করে তুলবে।

রাত ১২টায় সবাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। তার আগে ছোট্ট একটা কাজ করলাম, মাজহারের ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে শোবার ঘরের খাটে রেখে দিলাম। শাওন বলল, এর মানে কী?

আমি বললাম, ক্যাসেট রেকর্ডারটা রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত আশপাশের সব শব্দ রেকর্ড করবে। অশরীরীরা যদি কোনো কথা বলে, তাও রেকর্ড হয়ে যাবে। ভূত-প্রেতের সঙ্গে এই পদ্ধতিতে যোগাযোগ করাকে বলে EVP (Electronic Voice Phenomena).

EVP নিয়ে পৃথিবীজুড়ে মাতামাতির শুরুটা করেন সুইডেনের একজন অপেরা গায়ক, নাম ফ্রেডরিখ জারগেনসন (Fredrich Jurgenson)। তিনি তাঁর স্টকহোমের বাড়ির জানালায় একটা রেকর্ডার বসান। তিনি চাইছিলেন পাখিদের গান রেকর্ড করবেন। গায়কের বাড়িটি গ্রামে। চারদিকে লোকালয় নেই। অতি নির্জন। গায়ক রেকর্ডার বসিয়ে শহরে চলে এলেন। শহরে নানা ব্যস্ততায় সারা দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। রেকর্ডার চালালেন। সেখানে প্রচুর পাখির গান আছে, তবে তার সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপারও আছে। একটি পুরুষকণ্ঠ বলছে, 'পাখিরা রাতে গান করে।' অপেরা গায়ক হতভম্ব। পুরুষকণ্ঠ কোত্থেকে এল? তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত শূন্য বাড়িতে ক্যাসেট রেকর্ডারে শব্দ রেকর্ড করতে থাকলেন। পুরুষকণ্ঠ আবারও পাওয়া গেল। সে এবার সরাসরি ফ্রেডরিখ এবং তাঁর কুকুর কেরিনো (carino)-কে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে। ফ্রেডরিখ তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখলেন। এই বই পড়ে উৎসাহিত হলেন লেটভিয়ান সাইকোলজিস্ট কনস্টানটিন রোদিভ (Konstantin Ravdive)। তিনি সত্তর হাজারের বেশি ভয়েস রেকর্ড করলেন। একটি বই লিখলেন, নাম Amazing Experiment in Electronic Communication with the dead.

বইটি বেস্ট সেলার হলো। পৃথিবীজুড়েই EVP নিয়ে হৈ চৈ শুরু হলো। নানা EVP সোসাইটি হলো। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সোসাইটিরা যুক্ত হলো একে অন্যের সঙ্গে।

ভূতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপার ক্যাসেট রেকর্ডারের কারণে অনেক সহজ হয়ে গেল। একটি নির্জন বাড়ি, একটা ক্যাসেট রেকর্ডার।

এখন দেখা যাক বিজ্ঞান EVP নিয়ে কী বলে? EVP-কে সরাসরি ভুয়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ ভূতের কথা তো রেকর্ড করা। বিজ্ঞান বলছে-

১. ক্যাসেট রেকর্ডারের রেডিও সিগন্যাল রিসিভার থাকে। রেকর্ডার মাঝেমধ্যে রেডিও সিগন্যাল রিসিভ করে বলে অশরীরী কণ্ঠ শোনা যায়।

২. ক্যাসেট রেকর্ডারের আশপাশে রাখা কোনো বস্তুও বেতারকেন্দ্রের সিগন্যাল ধরতে পারে। রেডিও সিগন্যাল রিসিভ করার যন্ত্র খুব সাধারণ। দুটি ধাতব বস্তু খুব কাছাকাছি এলেই হলো। সেমি কন্ডাকটার মানেই রেডিও সিগন্যাল রিসিভার। অনেকের দাঁতের ফিলিংও রেডিও সিগন্যাল রিসিভার হিসেবে কাজ করে। দাঁতের ভেতর থেকে রেডিও স্টেশনের কার্যক্রম শোনা যায়।

৩. EVP হিসেবে যেসব রেকর্ডিং পাওয়া যায়, তার সবই অর্থহীন হিজিবিজি শব্দ। মানুষ হিজিবিজি আওয়াজে অর্থ খুঁজে পায়। আকাশের মেঘের স্তূপ দেখে মানুষ কল্পনা করে এটা পাখি, এটা হাতি। শব্দের বেলাতেও একই রকম কল্পনা।

৪. পৃথিবীর আয়ানোস্ফেয়ারের অস্বাভাবিকতায় এক জায়গার শব্দ অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। কিছু কিছু EVP-র ক্ষেত্রে তা-ই হয়তো ঘটেছে।

নুহাশপল্লীতে তিন দিন কাটিয়ে আমি ঢাকায় ফিরলাম। হাত সচল হয়েছে। 'মধ্যাহ্ন' নামের উপন্যাস শুরু করেছি। ক্লান্তিহীন লেখা চলছে।

পাঠকরা নিশ্চয়ই জানতে আগ্রহী আমার অশরীরী কণ্ঠ রেকর্ড এক্সপেরিমেন্টের কী হলো? আমি বলতে চাইছি না। সব কিছু বলতে নেই।

'The ghost of Roger Casement

Is beating on the door.'

W. B. yeats

নিষিদ্ধ গাছ

ধ্রুব এষের সঙ্গে আমার সখ্য দীর্ঘদিনের। তার চুল-দাড়ি, হাঁটার ভঙ্গি, পোশাক এবং জীবনচর্যা সবই আলাভোলা। তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্প হচ্ছে, নিজের বিছানা কারো সঙ্গে 'শেয়ার' করা সম্ভব নয় বলে সে চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আত্মীয়, বন্ধুদের চাপে শেষটায় শর্ত সাপেক্ষে বিয়েতে রাজি হয়। শর্ত হচ্ছে_তার স্ত্রী সারা দিন তার সঙ্গে থাকতে পারবে, কিন্তু সূর্য ডোবার পর পর বেচারিকে তার মায়ের বাড়িতে চলে যেতে হবে। ধ্রুব বিয়ে করেছে। শোনা যায়, তার স্ত্রী শর্ত মেনে নিয়েছে এবং এই দম্পতি সুখেই আছে।

যা-ই হোক, ধ্রুবের কাছ থেকে শোনা একটি লোকগল্প দিয়ে রচনা শুরু করা যাক।

মহাদেব স্বর্গে নন্দিভৃঙ্গিদের নিয়ে আছেন। মহাদেবের মনে সুখ নেই, কারণ কোনো নেশা করেই আনন্দ পাচ্ছেন না। তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন নেশার বস্তুর সন্ধানে। দেখা করলেন লোকমান হেকিমের সঙ্গে, যদি লোকমান হেকিম কিছু করতে পারেন। ইনিই একমাত্র মানুষ, যাঁর সঙ্গে গাছপালারা কথা বলে। মহাদেব এবং লোকমান হেকিম বনেজঙ্গলে ঘুরছেন, হঠাৎ একটা গাছ কথা বলে উঠল। গাছ বলল, লোকমান হেকিম, আমি গাঁজাগাছ। আমাকে মহাদেবের হাতে দিন। মহাদেবের নেশার বাসনা তৃপ্ত হবে। মহাদেব গাঁজাগাছ নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। গাঁজাগাছই একমাত্র গাছ, যা পৃথিবী থেকে স্বর্গে গেল।

এই গাঁজাগাছ আমি প্রথম দেখি বৃক্ষমেলায় বন বিভাগের স্টলে। নুহাশ পল্লীর ঔষধি বাগানে এই গাছ নেই। আমি কিনতে গেলাম। আমাকে জানানো হলো, এই গাছ নিষিদ্ধ। আনা হয়েছে শুধু প্রদর্শনীর জন্য। অনেক দেনদরবার করেও কোনো লাভ হলো না।

আমি গাঁজাগাছ খুঁজে বেড়াচ্ছি_এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ তাদের দলে ভিড়েছি বলে বিমল আনন্দ পেলেন, আবার কেউ কেউ আমার দিকে বক্রচোখে তাকাতে লাগলেন। 'Thou too brutus' টাইপ চাউনি।

জনৈক অভিনেতা (নাম বলা যাচ্ছে না, ধরা যাক তার নাম পরাধীন) আমাকে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি গাঁজাগাছ খুঁজে পাচ্ছেন না এটা কেমন কথা! আমাকে বলবেন না? আমি তো গাঁজার চাষ করছি।

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, কোথায় চাষ করছ?

আমার ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে। আমার অনেক টব আছে। ফ্রেশ জিনিস পাই। ফ্রেশ জিনিসের মজাই আলাদা।

আমি বললাম, তুমি গাঁজার চাষ করছ, তোমার স্ত্রী জানে?

না। তাকে বলেছি, এগুলো পাহাড়ি ফুলের গাছ। টবে পানি আমার স্ত্রী দেয়।

পরাধীনের সৌজন্যে দুটি গাঁজাগাছের টব চলে এল। যে দিন গাছ লাগানো হলো এর পরদিনই চুরি হয়ে গেল। বুঝলাম, যে নিয়েছে তার প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশি।

গাঁজার চাষ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। গাঁজা খাওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চয়ই নিষেধাজ্ঞা আছে। বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ডবুকে (গাজী শামসুর রহমান) প্রকাশ্যে সিগারেট খেলে ১০০ টাকা শাস্তির কথা বলা হয়েছে। গাঁজা বিষয়ে কিছু পেলাম না। প্রকাশ্যে থুথু ফেললেও ১০০ টাকা জরিমানা। রমজান মাসে মুসল্লিদের থুথু ফেলায় কি আইন শিথিল হবে?

গাঁজা খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সরকার মনে হয় নমনীয়। মাজার মানেই গোল হয়ে গাঁজা খাওয়া। লালনের গান শুনতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহর মাজারে গিয়েছিলাম। গাঁজার উৎকট গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। এর মধ্যে একজন এসে পরম বিনয়ের সঙ্গে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'স্যার, খেয়ে দেখেন। আসল জিনিস। ভেজাল নাই।' সিগারেটের তামাক ফেলে গাঁজা ভরে এই আসল জিনিস বানানো হয়েছে।

গাঁজাগাছ সম্পর্কে কিছু তথ্য। আমার লেখা বৃক্ষকথা নামের বইয়ে বিস্তারিত আছে। এই বইটি অন্যপ্রকাশ থেকে বের হয়েছে। প্রথম দিনের বিক্রি দেখে অন্যপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী মাজহার অবাক। দ্বিতীয় দিনে অদ্ভুত কাণ্ড। যারা বই কিনেছে, তারা সবাই বই ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। তারা হুমায়ূন আহমেদের কাছে গল্প চায়। বৃক্ষবিষয়ক জ্ঞান চায় না। হা হা হা।

গাঁজাগাছের বোটানিক্যাল নাম Canabis Sativa Linn গোত্র হলো Urticacea.

গাঁজাগাছের স্ত্রী-পুরুষ আছে। দুটিতেই ফুল হয়। তবে পুরুষ-গাছের মাদক ক্ষমতা নেই।

স্ত্রী-গাছের পুষ্পমঞ্জুরি শুকিয়ে গাঁজা তৈরি হয়। এই গাছের কাণ্ড থেকে যে আঠালো রস বের হয় তা শুকালে হয় চরস। চরস নাকি দুর্গন্ধময় নোংরা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে খেতে হয়।

স্ত্রী-গাঁজাগাছের পাতাকে বলে ভাং। এই পাতা দুধে জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় ভাঙের শরবত, অন্য নাম সিদ্ধির শরবত। এই শরবত ভয়ংকর এক হেলুসিনেটিং ড্রাগ।

আমার বন্ধু আর্কিটেক্ট করিম ভাঙের শরবত খেয়ে কলকাতার এক হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে ছিল। তার কাছে মনে হচ্ছিল, তার দুটি হাত ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। হোটেলের জানালা দিয়ে সেই হাত বের হয়ে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে।

গাঁজাগাছের ফুল, ফল, পাতা এবং গা থেকে বের হওয়া নির্যাসে আছে সত্তরের বেশি ক্যানাবিনয়েডস। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো ক্যানাবিনল, ক্যানাবিডিওল, ক্যানাবিডিন। নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ (Alkaloids)ও প্রচুর আছে।

এসব জটিল যৌগের কারণেই মাদকতা এবং দৃষ্টিবিভ্রম।

যে বস্তু শিব নন্দি ভৃঙ্গিকে নিয়ে হজম করবেন আমরা তা কিভাবে হজম করব! কাজেই 'শত হস্তেন দূরেৎ' (শত হস্ত দূরে)।

মানুষ কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের কথা জানা গেল। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের বিষয়টা কী?

এই নিষিদ্ধ গাছের ফলের নাম 'গন্ধম'। বিবি হাওয়ার প্ররোচনায় আদম এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন।

সমস্যা হলো গন্ধম আরবি শব্দ নয়। ফারসি শব্দ। পবিত্র কোরআন শরিফে কোথাও এই ফলের নাম নেওয়া হয়নি। হাদিসেও নাম নেই। তাহলে আমাদের কাছে এই গন্ধম কোত্থেকে এল? বাউলরা গান পর্যন্ত লিখলেন, 'একটি গন্ধমের লাগিয়া...।'

যিশুখ্রিস্টের জন্মের চার শ বছর আগে নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্পর্কে লিখলেন ইনক। তার বইয়ে (The sedipigraphic book of inok) বলা হয়েছে, এই গাছ দেখতে অবিকল তেঁতুলগাছের মতো। ফল আঙুরের মতো, তবে সুগন্ধযুক্ত।

গ্রিক মিথ বলছে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল হলো বেদানা।

রাব্বি নেসেমিয়া বলছেন, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল হলো ডুমুর।

ধর্মগ্রন্থ তালমুদ বলছে নিষিদ্ধ ফল আঙুর।

প্রাচীন চিত্রকলায় আদম, ইভ এবং সর্পের সঙ্গে যে ফলটি দেখা যায় এর নাম আপেল।

এখন তাহলে মীমাংসাটা কী?

পাদটীকা : বিষাক্ত ফলের তালিকায় আছে আপেল! আপেলের বিচিতে থাকে বিষ। বিষের নাম সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইড। একটা বিচি খেলে তেমন কিছু হয় না। একের অধিক খেলে...।

দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?

আমার কর্মজীবনের শুরুটা ময়মনসিংহ অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে_লেকচারার, ভৌত রসায়ন।

মা ও ভাইবোনদের ঢাকার শ্যামলীতে রেখে আমি কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছি। মন যথেষ্টই খারাপ। ঢাকা শহরে একবার শিকড় বসে গেলে শিকড় ছেঁড়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাবার মৃত্যুশোক মা ও ভাইবোনেরা সামলে উঠতে পারেনি। তাদের সঙ্গে থাকা আমার জন্য খুবই জরুরি। আমি নিজেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বছরের পর বছর হলে-হোস্টেলে থেকে ক্লান্ত। কিন্তু উপায় কী!

ঢাকার এক ওষুধ কম্পানিতে ভালো চাকরির সুযোগ ছিল, কিন্তু পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে অনেক আকর্ষণীয় মনে হলো।

অল্প কিছু বই সঙ্গে নিয়ে ময়মনসিংহ উপস্থিত হলাম। অল্প কিছু বইয়ের একটি জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা। পাঠক কি ভাবছেন এই গদ্যলেখক বিরাট কবিতাপ্রেমিক? ঘটনা তা না। এ বইটি আমি নিয়েছি সব কবিতা মুখস্থ করার জন্য। বন্ধু আনিস সাবেতের জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতা মুখস্থ। আমি ঠিক করেছি আনিস সাবেত যখন আমাকে দেখতে ময়মনসিংহে আসবেন, তখন পুরো রূপসী বাংলা মুখস্থ শুনিয়ে তাঁর পিলে চমকে দেব। পুরো কবিতার বই মুখস্থ করার পেছনে কাব্যপ্রেম নেই, আছে আনিস ভাইয়ের পিলে চমকে দেওয়ার বাসনা।

ক্লাস নিতে শুরু করেছি, দ্রুতই রুটিনের ভেতর ঢুকে গেছি। বক্তৃতা তৈরির ফাঁকে ফাঁকে চলছে কবিতা মুখস্থ। থাকি ভাড়া করা একটি একতলা বাড়িতে। প্রতি রুমে দুজন করে শিক্ষক। আমার রুমমেট ড. সিরাজুল কবির এক দিন অবাক হয়ে বললেন, সারা দিন কবিতার বই পড়েন, ব্যাপার কী?

আমি বললাম, শরীর ধুতে হয় সাবান দিয়ে। আর মন ময়লা হলে মন ধুতে হয় কবিতা দিয়ে।

সহকর্মী চোখ কপালে তুলে বললেন, কী বলেন, কী বলেন এসব! সত্যি?

অবশ্যই সত্যি।

দেখি আপনার কবিতার বই। আমিও রোজ শোবার আগে কবিতা পড়ে মন ধোলাই করব।

ড. সিরাজের কবিতা পাঠের উৎসাহে দ্রুত ভাটা পড়ল। কবিতা পড়ে তিনি জীবনানন্দ সম্পর্কে কঠিন সব কথা বলতে শুরু করলেন। সবচেয়ে কম কঠিন কথাটি হলো_"এই কবিকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ জেলায় পাঠিয়ে দিয়ে সুচিকিৎসা করা অতীব প্রয়োজন ছিল।"

যাই হোক, আমার রুমমেট একটি বিষয়ে অতি উৎসাহে আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন। কোনো একটি কবিতা মুখস্থ হলেই আমি তাঁর কাছে পরীক্ষা দিই। তিনি বই হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখেন আমি কোথাও ভুল করলাম কি না।

আড়াই মাসের মাথায় ড. সিরাজ আমার দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হলেন।

১. হুমায়ূন আহমেদ নামক মানুষটিকেও একটি বিশেষ জেলায় পাঠিয়ে দ্রুত সুচিকিৎসা করা প্রয়োজন। দেরি হলে সমস্যা হতে পারে।

২. এ মানুষটির স্মরণশক্তি অত্যন্ত ভালো। (প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ঔপন্যাসিক হওয়ার অতি আবশ্যকীয় শর্তের একটি_ভালো স্মৃতিশক্তি)।

রূপসী বাংলার প্রতিটি কবিতা মুখস্থ হয়েছে। আনিস ভাইকে চমকে দেওয়ার প্রস্তুতি শেষ।

উনাকে চমকে দেওয়া গেল না। উনি আমাকে চমকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পার্সেলে একটি প্যাকেট পাঠালেন। প্যাকেটে একটি বই। বইয়ের ভেতর তাঁর লেখা একটি চিঠি এবং দেড় শ টাকা। চিঠিতে লেখা_

হুমায়ূন,

আমি বিশেষ ঝামেলায় আছি। কী ঝামেলা, তা বলতে পারছি না। কোনো একদিন হয়তো বলব। ঝামেলার কারণে তোমার এখানে আসতে পারছি না। তোমার কাছে এসে হৈ চৈ করে যে টাকাটা খরচ করব বলে আলাদা করে রেখেছিলাম তা তোমাকে পাঠিয়ে দিলাম। এই সঙ্গে একটি বই। তুমি উদ্ভট বিষয় পড়তে ভালোবাস। এ বইটি যথেষ্টই উদ্ভট।

আনিস সাবেত

(অনেক দিন আগের কথা। আনিস ভাইয়ের চিঠিটা সংগ্রহে নেই। স্মৃতি থেকে লিখলাম। একটু আগেই লিখেছি আমার স্মৃতিশক্তি ভালো)।

আনিস ভাইয়ের পাঠানো বইটির নাম দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ? লেখকের নাম এরিখ ভন দানিকেন। ভদ্রলোকের বাড়ি জার্মানিতে। তিনি ভূ-পর্যটক এবং শখের গবেষক। গবেষণার বিষয় প্রাচীন পৃথিবীর স্থাপত্যকলা। এই শখের প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার ফসল হলো জগদ্বিখ্যাত বই দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ? পৃথিবীর সব কয়টি ভাষায় বইটি অনূদিত হলো। লেখক রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি পেলেন।

বইটিতে লেখক বললেন, মানবপ্রজাতির শুরুর দিকে মহাকাশযানে চড়ে কিছু ভিনগ্রহের প্রাণী এসেছিল। তারা দেখতে মানুষের মতো। পৃথিবীতে সভ্যতার শুরুটা তারাই করে যায়। ভিনগ্রহের মানুষের কর্মকাণ্ড দেখে পৃথিবীর মানুষ ধরে নেয় এরাই দেবতা। তারা দেবতাদের পূজা শুরু করে। দেবতাদের জন্য মন্দির বানাতে থাকে।

প্রমাণ হিসেবে তিনি অতি প্রাচীন মন্দিরের কিছু দেবমূর্তির কথা উল্লেখ করলেন। এসব মূর্তি দেখে মনে হয় এরা স্পেস স্যুট পরে আছে। মাথায় হেলমেট। হেলমেটে অ্যান্টেনা।

লেখক দেখালেন মায়া সভ্যতার দেয়ালচিত্র, সেখানে মহাকাশযানে একজন নভোচারী বসে আছে।

লেখক মন্দিরের ছবি দিলেন। সব মন্দির আকাশের দিকে সরু হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হয় নভোযান।

দানিকেন বললেন, পিরামিড বানানোর প্রযুক্তি মানুষের ছিল না। ভিনগ্রহের মানুষ বানিয়ে দিয়েছে। বালু থেকে গ্লাস বানাতে যে প্রচণ্ড তাপ লাগে সেই প্রযুক্তিও মানুষের ছিল না, কিন্তু গ্লাস এবং ফুলগোরাইটের অপূর্ব মূর্তি পাওয়া গেছে।

আমি বই পড়ে অভিভূত। আমার কাছে মনে হলো শখের এ প্রত্নতত্ত্ববিদ অসাধারণ কাজ করেছেন। দানিকেন সাহেবের ভূত অনেক দিন আমার মাথায় চেপে রইল। তিনি অনেকগুলো বই লিখলেন, সব জোগাড় করলাম। বইগুলো পড়ি আর ভাবি_ইস ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি একবার দেখা করতে পারতাম?

বিস্ময়করভাবে এই সুযোগ তৈরি হলো। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমি তখন সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

হল লোকে লোকারণ্য। দানিকেন ভিডিও ক্লিপিং দেখিয়ে চমৎকার বক্তৃতা করলেন। প্রমাণ করে দিলেন অতি প্রাচীনকালে ভিনগ্রহের মানুষ এসেছিল। মানবসভ্যতার শুরু তারা করে দিয়েছে। তুমুল করতালিতে বক্তৃতা শেষ হলো। দানিকেন বললেন, এই হলঘরে এমন কেউ আছে আমার পেশ করা হাইপোথিসিস যে বিশ্বাস করে না? কেউ কিছু বলল না, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়ালাম। দানিকেন অবাক হয়ে বললেন, তুমি কেন বিশ্বাস করছ না?

আমি বললাম, আপনার হাইপোথিসিসে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কর্মক্ষমতাকে ছোট করা হয়েছে।

দানিকেন বললেন, তুমি মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিয়ে ধোঁয়াটে কথা না বলে আমি যেসব যুক্তি দিয়েছি তা খণ্ডন করো। একটি করলেই হবে।

আমি বললাম, আপনি বক্তৃতায় বলেছেন, বালি থেকে কাচ বানাতে যে তাপ লাগে তা তৈরির ক্ষমতা মানুষের একসময় ছিল না, অথচ তারও আগে কাচের তৈরি মানুষের মাথার খুলির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে।

তুমি এটা ভুল বলতে চাচ্ছ?

না। পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবেই কাচ ও ফুলগেরাইট তৈরি হয়। বালুতে যখন বজ্রপাত হয় তখন ঘটনাটা ঘটে। প্রাকৃতিকভাবে তৈরি কাচ নিয়ে মূর্তি বানানো হয়েছে। ভিনগ্রহের মানুষের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি।

দানিকেন আমার ওপর স্পষ্টতই রাগলেন, কিন্তু রাগ প্রকাশ করলেন না। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ইন্টারেস্টিং হাইপোথিসিস। আমার যে গবেষকদল আছে তাদের এই হাইপোথিসিসের কথা বলা হবে। আমরা তুচ্ছ বিষয়কেও গুরুত্ব দিই।

চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছেন, যে বস্তু আকাশে ওঠে তাকে একসময় মাটিতে নামতে হয়। দানিকেন সাহেব আকাশে উড়ছিলেন, তাঁকে কঠিন মাটিতে নামতে হলো। এই কাজটি করল আমেরিকান টিভি চ্যানেল অইঈ। তারা দানিকেন এবং তাঁর থিওরি নিয়ে এক ঘণ্টার একটি প্রতিবেদন তৈরি করল। বিজ্ঞানীদের কয়েকটি দল দানিকেনের প্রতিটি যুক্তি কঠিনভাবে খণ্ডন করল। প্রতিবেদনের আসল বোমাটি ছিল সব শেষে। সেখানে দেখানো হলো দানিকেন অর্ডার দিয়ে স্পেস স্যুট এবং মাথায় হেলমেট পরা মূর্তি বানাচ্ছেন। এসব মূর্তিই তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর গ্রন্থে। দানিকেনকে যখন এই ফাঁকিবাজির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো, তিনি শুধু হতাশ চোখে তাকালেন। কোনো জবাব দিতে পারলেন না, জবাব দেওয়ার চেষ্টাও করলেন না।

পাদটীকা

যে মানুষ ঈশ্বর কণা (ড়েফ ঢ়ধৎঃরপষব) গবেষণাগারে তৈরি করেছে তার ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করার কোনো উপায় এখন নেই, অতীতেও ছিল না।

মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরামের লেখা একটি ভৌতিক গল্পের নাম 'মহেশের মহাযাত্রা'। পরশুরাম অতিপণ্ডিত এবং অতিরসিক একজন মানুষ। তাঁর রসবোধের নমুনা দিই-

রেস্টুরেন্টে এক ছেলে তার বন্ধুদের নিয়ে চা খেতে গিয়েছে। ছেলেটির বাবাও হঠাৎ করে সেখানে গেলেন। ছেলেকে রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতে দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রচুর গালাগাল করে বের হয়ে এলেন। ছেলের বন্ধুরা বলল, তোর বাবা তোকে এত গালমন্দ করল, আর তুই কিছুই বললি না?

ছেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবার কথার কী করে জবাব দিই! একে তো তিনি বাবা, তারপর আবার বয়সেও বড়।

বাবা ছেলের চেয়ে বয়সে বড়-এই হলো পরশুরামের রসবোধ। তিনি হাসি-তামাশা, ব্যঙ্গ-রসিকতার গল্পের ভিড়ে

'মহেশের মহাযাত্রা' নামের অদ্ভুত এক ভূতের গল্পও লিখে ফেললেন। মহেশ নামের এক পাঁড় নাস্তিকের গল্প, যে মহেশ অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করেছে ঈশ্বর সমান শূন্য।

একদল নাস্তিকের ঈশ্বরকে শূন্য প্রমাণ করার চেষ্টা যেমন আছে, আবার কঠিন আস্তিকদের চেষ্টা আছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার। ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালে অঙ্কের একজন শিক্ষক ইনফিনিটি সিরিজ দিয়ে প্রমাণ করলেন ঈশ্বর আছেন। ভুবনখ্যাত অঙ্কবিদ ইউলার চার্চের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে বিদঘুটে এক অঙ্ক লিখে বললেন, এই সমীকরণ প্রমাণ করে ঈশ্বর নেই। আপনারা কেউ কি এই সমীকরণ ভুল প্রমাণ করতে পারবেন? চার্চের পাদ্রিরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। কারণ, অঙ্ক-বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই।

সম্প্রতি পত্রিকায় দেখলাম কঠিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বলেছেন, ঈশ্বর এবং আত্মা বলে কিছু নেই। স্বর্গ-নরক নেই। সবই মানুষের কল্পনা। মানব-মস্তিষ্ক হলো একটা কম্পিউটার। কারেন্ট চলে গেলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যু হলো মানব-মস্তিষ্ক নামক কম্পিউটারের কারেন্ট চলে যাওয়া।

স্টিফেন হকিং কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। মস্তিষ্ক ছাড়া তাঁর শরীরে সব কলকবজাই অচল। তিনি নিজেই মনে করছেন তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় মানুষ সাধারণত আস্তিকতার দিকে ঝুঁকে। তিনি পুরোপুরি অ্যাবাউট টার্ন করে বললেন, ঈশ্বর নেই। কোনো পবিত্র নির্দেশ ছাড়াই (Devine intervention) বিশ্বও তৈরি হতে পারে। শুরুতে এ ধরনের সরাসরি কথা তিনি বলতেন না। তাঁর কথাবার্তা ছিল সন্দেহবাদীদের মতো-ঈশ্বর থাকতেও পারেন, আবার না-ও থাকতে পারেন।

স্টিফেন হকিংয়ের এক উক্তিতে ঈশ্বর ধ্বংস হয়ে গেছে মনে করার কারণ নেই। আবার অনেক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে জোরালো বক্তব্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বর অধরাই থেকে গেছেন।

আমি সামান্য বিপদে পড়েছি, স্টিফেন হকিংয়ের মন্তব্যে আমার কী বলার আছে, তা অনেকেই জানতে চাচ্ছেন। এসব জটিল বিষয়ে আমি নিতান্তই অভাজন। তার পরও বিচিত্র কারণে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

বিজ্ঞানীদের একটি শর্ত হকিং সাহেব পালন করেননি। তাঁরা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলেন না। যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন না তখন বলেন, তিনি অনুমান করছেন বা তাঁর ধারণা। হকিং সরাসরি বলে বসলেন, ঈশ্বর নেই। তিনি নিজেও কিন্তু পদার্থবিদ্যায় তাঁর থিওরি একাধিকবার প্রত্যাহার করেছেন।

হকিং সাহেবের ধারণা-অমরত্ব বলে কিছু নেই। তিনি সম্ভবত ভুলে গেছেন উঘঅ অণু অমর। আমাদের এবং এ জগতের সৃষ্ট সব প্রাণী ও বৃক্ষের প্রতি নির্দেশাবলি দেওয়া আছে উঘঅ-তে। আমরা কখন যৌবনে যাব, কখন বুড়ো হব-সব নিয়ন্ত্রণ করছে উঘঅ অণু। এই অণুই সদ্য প্রসব হওয়া গো-শাবককে জানিয়ে দিচ্ছে, একটি বিশেষ জায়গায় তোমার জন্য তরল খাবার রাখা আছে। মুখ দিয়ে সেখানে ধাক্কা দেওয়ামাত্র তোমার খাবার বের হয়ে আসবে। আমরা বাস্তবে কী দেখি? বাছুর মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে ছুটে যাচ্ছে তার মায়ের ওলানের দিকে। তাকে কিছু বলে দিতে হচ্ছে না। তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে রহস্যময় উঘঅ.

এই রহস্যময় উঘঅ কি বলে দিচ্ছে না? 'হে মানব জাতি, তোমরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করো।' এ কারণেই কি মানুষ নিজের জন্য ঘর বানানোর আগে প্রার্থনার ঘর তৈরি করে?

হকিং বলছেন মানব-মস্তিষ্ক কম্পিউটারের মতো। সুইচ অফ করলেই কম্পিউটার বন্ধ। মৃত্যু মানব কম্পিউটারের সুইচ অফ।

সুইচ অফ করলেও কিন্তু কম্পিউটারের মেমোরি থেকে যায়। আবার পৃথিবীর সব কম্পিউটারের মেমোরি কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংরক্ষণ সম্ভব।

মহা মহা শক্তিধর (আল্লাহ্, ঈশ্বর, গড) কারো পক্ষে একইভাবে প্রতিটি মানুষের মেমোরি সংরক্ষণও সম্ভব। তখনো কিন্তু আমরা অমর। সংরক্ষিত মেমোরি দিয়ে প্রাণ সৃষ্টিও সেই মহাশক্তিধরের কাছে কোনো বিষয়ই না।

মানুষ নিজেও মহা মহা শক্তিধর। সেই মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে গেল। বিশ্বণ্ডে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তাকে কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়েছে। তাকে পদার্থবিদ্যার প্রতিটি সূত্র মেনে চলতে হচ্ছে। এই সূত্রগুলো আপনা-আপনি হয়ে গেছে? এর পেছনে কি কোনো পবিত্র আদেশ (Devine order) নেই?

একদল বলছে, প্রাণের সৃষ্টি 'ঈযধড়ং' থেকে। অণুতে অণুতে ধাক্কাধাক্কিতে জটিল যৌগ তৈরি হলো। একসময় জটিল যৌগ আরো জটিল হলো। সে নিজের মতো আরো অণু তৈরি করল। সৃষ্টি হলো প্রাণ। অণুতে অণুতে ধাক্কাধাক্কিতে একদিকে তৈরি হলো ধীমান মানুষ, অন্যদিকে তৈরি হলো গোলাপ, যার সৌন্দর্য ধীমান মানুষ বুঝতে পারছে। ব্যাপারটা খুব বেশি কাকতালীয় নয় কি?

আমি ওল্ড ফুলস ক্লাবের আড্ডায় প্রায়ই ঈশ্বর-বিষয়ক একটি গল্প বলি। পাঠকদের গল্পটি জানাচ্ছি। ধরা যাক এক কঠিন নাস্তিক মঙ্গল গ্রহে গিয়েছেন। সেখানকার প্রাণহীন প্রস্তরসংকুল ভূমি দেখে তিনি বলতে পারেন-একে কেউ সৃষ্টি করেনি। অনাদিকাল থেকে এটা ছিল। তার এই বক্তব্যে কেউ তেমন বাধা দেবে না। কিন্তু তিনি যদি মঙ্গল গ্রহে হাঁটতে হাঁটতে একটা ডিজিটাল নাইকন ক্যামেরা পেয়ে যান, তাহলে তাঁকে বলতেই হবে এই ক্যামেরা আপনা-আপনি হয়নি। এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। মনে করা যাক ক্যামেরা হাতে তিনি আরো কিছুদূর গেলেন, এমন সময় গর্ত থেকে একটা খরগোশ বের হয়ে এল। যে খরগোশের চোখ নাইকন ক্যামেরার চেয়েও হাজার গুণ জটিল। তখন কি তিনি স্বীকার করবেন যে এই খরগোশের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে?

মনে হয় স্বীকার করবেন না। কারণ, নাস্তিক আস্তিক দুই দলই জেগে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে বলে তাদের ঘুম ভাঙানো যায় না। বিপদে পড়ে সন্দেহবাদীরা। যতই দিন যায় ততই তাদের সন্দেহ বাড়তে থাকে। বাড়তেই থাকে।

পাদটিকা

রাতের অন্ধকারে এক অতিধার্মিক বাড়িঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, ঈশ্বরের সন্ধানে।

সেই লোক অবাক হয়ে বলল, সে কি! ঈশ্বর কি হারিয়ে গেছেন যে তার সন্ধানে বের হতে হচ্ছে?

ঈর্ষা ও ভালোবাসা

পবিত্র কোরআন শরিফের একটি আয়াতে আল্লাহপাক বলছেন, 'এবং বেহেশতে তোমরা প্রবেশ করবে ঈর্ষামুক্ত অবস্থায়।'

এর সরল অর্থ_শুধু বেহেশতেই মানুষ ঈর্ষামুক্ত, ধুলা-কাদার পৃথিবীতে নয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ঈর্ষা এক অর্থে আমাদের চালিকাশক্তি। মানবসভ্যতার বিকাশের জন্য ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। বেহেশতে যেহেতু সভ্যতা বিকাশের কিছু নেই, ঈর্ষারও প্রয়োজন নেই।

আমি নিজেকে ঈর্ষামুক্ত একজন মানুষ ভাবতে পছন্দ করি; যদিও জানি, এই মানবিক দুর্বলতামুক্ত হওয়া মহাপুরুষদের পক্ষেও সম্ভব নয়। একজন মহাপুরুষও ঈর্ষা করবেন আরেকজন মহাপুরুষকে। এটাই নিপাতনে সিদ্ধ।

যা-ই হোক, এক শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে কলকাতার দেশ পত্রিকা খুলে হিংসা নামের সর্পের ছোবল অনুভব করলাম। পত্রিকায় একটি উপন্যাসের সমালোচনা ছাপা হয়েছে। সমালোচক বলছেন, এই উপন্যাসের লেখক বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি। উপন্যাসটির নাম 'নূরজাহান'। লেখকের নাম

ইমদাদুল হক মিলন। দেশ পত্রিকায় এমন নির্ভেজাল প্রশংসা আমি আর কোনো লেখার হতে দেখিনি।

নূরজাহানের গল্প শেষ করতে মিলন প্রায় তেরো শ পৃষ্ঠা লিখেছেন। বাংলাদেশে এটিই মনে হয় সর্ববৃহৎ উপন্যাস। লেখক হিসেবে জানি একটি গল্পকে তেরো শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টানার অর্থ দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনীর পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, ক্লান্তি ও হতাশা। হতাশার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি, যেকোনো রচনাতেই লেখকের নানান হতাশা থাকে। গল্পটা যেমন দাঁড় করানো দরকার সে রকম করা গেল না। বিশেষ কোনো চরিত্র আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত, তা হলো না, এইসব।

হতাশার সঙ্গে আসে আনন্দ। গল্প শেষ করার আনন্দ। নিজের কথা বলি, মিসির আলি বিষয়ক মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠার একটি বড় গল্প (বৃহন্নলা) শেষ করে আমি গল্প শেষ হওয়ার আনন্দে অভিভূত হয়েছিলাম। নূরজাহান শেষ করে মিলনের আনন্দ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে চৌত্রিশ গুণ

বেশি হয়েছে। নূরজাহান বৃহন্নলার চেয়ে চৌত্রিশ গুণ বড়। সব লেখকই চান তাঁর নিজের আনন্দের ছায়া পাঠকের মধ্যে পড়ুক। লেখক যেন বুঝতে পারেন তাঁর কষ্ট জলে ভেসে চলে যায়নি।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাংলাদেশে মিলনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেন জানি ঘটছে না। উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করি। এখন দৈনিক পত্রিকাগুলোর ফ্যাশন হলো সাহিত্য বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করা। এরা বর্ষসেরা উপন্যাস, মননশীল লেখার তালিকা তৈরি করে এবং পাঠকদের ভাবতে বাধ্য করে, এসব রচনাই শ্রেষ্ঠ, বাকি সব আবর্জনা।

কালের কণ্ঠ দশটি সেরা উপন্যাসের তালিকা তৈরি করল, মিলনের নূরজাহান সে তালিকায় নেই। আমি ভাবলাম, মিলন এই পত্রিকায় কাজ করে বলেই হয়তো তার নাম নেই। লোকে না ভেবে বসে তারা নেপোটিজম করছে।

প্রথম আলোর সেরা দশেও মিলন নেই। এতে মিলনের মন খারাপ হয়েছে কি না জানি না, আমি বিরক্ত হয়েছি। মিলনকে ডেকে বলেছি, দৈনিক পত্রিকার সেরা দশের পুরো আয়োজনই ভুয়া। এই সেরা কারা নির্বাচন করেন? তাঁরা কি বছরে প্রকাশিত সব লেখা পড়েন?

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র একসময় বই নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করত (হয়তো এখনো করে), সেখানে প্রকাশিত বইগুলোর পরিচিতি ছাপা হতো। দায়িত্বে ছিলেন এক বিদগ্ধ সমালোচক। একদিন অবাক হয়ে দেখি, আমার গল্পগ্রন্থ 'আনন্দ বেদনার কাব্য' নিয়ে লেখা হয়েছে_হুমায়ূন আহমেদের কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সুন্দর। কিছু কবিতায় ছন্দের ত্রুটি দেখা গেলেও রূপক নির্মাণে কবির দক্ষতা আছে।

আমি মিলনের নূরজাহান প্রথম খণ্ড অনেক আগেই পড়েছিলাম। কালের কণ্ঠ ও প্রথম আলোর ভূমিকায় ব্যথিত হয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পড়ে শেষ করলাম। অবশ্যই এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। আমি হলে বইটি তিন শ পৃষ্ঠাতে সীমাবদ্ধ রাখতাম। নূরজাহানের প্রধান ত্রুটি, এর লেখক 'কড়ি দিয়ে কিনলামের' বিমল মিত্র হতে চেয়েছেন। যেন সবাই বলে, এই দেশের সবচেয়ে বড় উপন্যাস ইমদাদুল হক মিলন লিখেছেন। বৃহৎ উপন্যাস রচিত হবে_এটি কোনো লেখার চালিকাশক্তি হতে পারে না।

কবি ড ই ণবধঃং তাঁর ছেলেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, লেখকদের জন্য আলাদা নরক যদি থাকে, সেখানে থাকবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো। যেসব ভুল এই লেখাগুলোতে করা হয়েছে, তা লাল

কালিতে চিহ্নিত থাকবে। বাহুল্য দাগানো থাকবে। যা বাদ পড়েছে তাও উল্লেখ করা হবে। লেখক তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর ত্রুটি দেখে নরকযন্ত্রণায় অনন্তকাল দগ্ধ হবেন।

কবি ণবধঃং-এর কথা ধরে বলি, বিভূতিভূষণের নরকে থাকবে পথের পাঁচালি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরকে থাকবে পুতুল নাচের ইতিকথা এবং ইমদাদুল হক মিলনের নরকে নূরজাহান। এই অর্জনই বা কম কী! ইমদাদুল হক মিলনকে অভিনন্দন!

পাদটীকা-১

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ আমাকে এবং মিলনকে একটি বই উৎসর্গ করেছিলেন। বইটির নাম 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'। ঔপন্যাসিক হিসেবে আমরা দুজনই নষ্ট_এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আমি বিষয়টায় মজা পেয়ে হাসলাম। মিলন প্রতিশোধের বাসনায় হুমায়ুন আজাদকে একটি বই উৎসর্গ করল। বইটির নাম 'বনমানুষ'।

অধ্যাপক আজাদ এ ঘটনায় যথেষ্টই বিরক্ত হয়েছিলেন।

পাদটীকা-২

ইমদাদুল হক মিলনের মতো ধৈর্য আমার নেই। কাজেই তেরো শ পৃষ্ঠার রং পেন্সিল লিখতে পারছি না। এই পর্বেই ইতি টানছি। পাঠকদের সঙ্গে আবারও কোনো এক প্রসঙ্গে দেখা হবে। বিদায়।